আমাদের দেশে ছিল আউল বাউলের গান, পাঁচালি-ব্রতকথার গান, মঙ্গলকাব্যের গান, জারি-সারির গান। ষোড়শ শতক থেকে নদেয় এল কীর্তনের বান। এর সঙ্গে ছিল জয়দেবের স্তোত্র গান, হুসেন শাহির দরবারী গান, বিষ্ণুপুরী ঘরানার গান, যদু ভট্টের আপন গান। কিন্তু ক্রমশই উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের উষাকালে সঙ্গীতের ঠাঁট হয়ে গেল শিথিল, দরবারী গান এসে ঠেকল ঠুংরি, দাদরা, কাজরিতে। লোকগীতি নেমে এল হাফ আখড়াই, হাফ খেউড়, পক্ষীর গানে। এই অবক্ষয়ের দিনে রামনিধি গুপ্ত তাঁর সুললিত টপ্পার গানের ডালি সাজালেন, অপর দিকে রামমোহন ধ্রুপদ অবলম্বন করে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেন। এই ভাবেই মন্দাক্রান্তা তালে গান চলতে লাগল।

গানের মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল বিশেষ আবেগের, বিশেষ ঘটনার। হিন্দুমেলার সময় থেকে এক স্বদেশি জোয়ার গানে প্রবেশ করল। সে ব্যাপারেও অগ্রণী ছিলেন ঠাকুর পরিবার। হিন্দুমেলার সূচনায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখলেন, 'মিলে সবে ভারত সন্তান/একতান মনপ্রাণ/গাও ভারতের জয়গান'। এটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হত। অন্য জনপ্রিয় গানটি ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'মলিন মুখচন্দ্রমা/ভারত তোমারি', পরের ঠাকুর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন, 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে/লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে'। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম স্বদেশি কবিতা এই মঞ্চেই পাঠ করেন। ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা ছাড়াও স্বদেশি সঙ্গীতের অন্যতম রচয়িতা মনমোহন বসু।

হিন্দুমেলার পর্বের পরে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশি সঙ্গীত আবার স্ফূর্তি পায়। এবারও ঠাকুরবাড়িকে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায়। প্রধান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাখীবন্ধন দিবসে টাউন হলে পৌঁছে গান ধরলেন—'বাংলার মাটি বাংলার জল'। এই সঙ্গীতটি ছাড়াও আরও অজস্র সঙ্গীত তিনি এই সময়ে রচনা করেন। তার মধ্যে 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/কি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী', 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' কিংবা 'সার্থক

Scanned with CamScanner

জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' বা 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়বো না মা'। এমনকি আরও সরাসরি 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান/তুমি কি এমন শক্তিমান' প্রভৃতি অবিস্মরণীয় সঙ্গীত রচনা করেন। এছাড়া ১৮৯৬ সালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' কবিতাটিতেও সুর দেন ও নিজে ঐ গান করেন।

এর পরেই ছিলেন ঠাকুরবাড়ির সরলাদেবী চৌধুরানী। ভারতীতে মাঘ ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী/গাহে আজি হিন্দুস্থান' দশটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সঙ্গীতের অন্যতম। ঠাকুরবাড়ির অপর সঙ্গীতকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুবিখ্যাত গানটি এই সময়ই রচনা করেন—'চল রে চল সবে ভারত সন্তান/মাতৃভূমি করে আহ্বান।'

স্বদেশি যুগের সঙ্গীতকারদের মধ্যে অন্যতম অশ্বিনীকুমার দত্ত। তাঁর গানের নমুনা এই রকম 'আয়রে আয়রে ভারতবাসী আয় সবে মিলে/প্রণমি ভারতমাতার চরণকমলে/আয়রে মুসলমান ভাই জাতিভেদ নাই/একজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে'। মুসলমান কবি কায়কোবাদ গান বাঁধলেন 'ক্ষমা কর মা বঙ্গভূমি/ক্ষমা কর মা হৃদয় খুলে/আমি যে তোর অবোধ ছেলে/লবি নে মা কোলে তুলে'। মফিজুদ্দিন বয়াতি লিখলেন 'গেল রে সোনার বাংলা রসাতলে পাপের ফেরে/কি দিয়া কি কৈরা নিলি দেখলি না রে হিসাব কইর‍্যো'। এরপর আসর মাতালেন মুকুন্দদাস। তাঁর বিখ্যাত গান 'বাবু বুঝবি কি আর মলে/কাঁধে সাদা ভূত সেধেছে একদম দফা সারলে'। অন্যগান 'রাম রহিম না খুদা কহ ভাই/মনটা খাঁটি রাখ জি/দেশের কথা ভাব ভাইরে/দেশ আমাদের মাতাজি'।

আরও ছিলেন কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তিনি লিখলেন, 'আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল/হল লাঠির ঘায়ে/ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায় বন্দেমাতরম্ বলে'। এই সুরেই সুর মেলালেন মুকুন্দদাস, লিখলেন, 'বন্দেমাতরম্ বলে/নাচরে সকলে, কৃপাণ লইয়া হাতে'।

স্বদেশি যুগের অন্যান্য গীতিকারদের মধ্যে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের বিখ্যাত স্বদেশি সঙ্গীত—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়', অতুলপ্রসাদ সেনের 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা' বা 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' দেশপ্রেমের এক আবহ সৃষ্টি করে।

বাংলার লোকসঙ্গীত ছিল আর এক জলসাঘর। বাউলগান, তরজাগানের কথা আগেই বলা হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হল সাজন গাজীর গান, নীলবিদ্রোহের গান, মানবতাবাদী লালন ফকিরের এবং হাসন রাজার গান। এর সঙ্গে বহমান মালদহের গম্ভীরা, পদ্মাপারের ভাওয়াইয়া, চটকা, ভাটিয়ালি। কে না মুগ্ধ হয়েছে আব্বাসউদ্দিন আহমেদের, শচীনদেব বর্মনের, গিরীন চক্রবর্তীর এবং পরবর্তীকালের নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং অমর পালের লোকগীতিতে।

Scanned with CamScanner